অনেকদিন পর অফিসের ব্যস্ততার ফাঁকে রূপম আজ সময় পেল জমে থাকা চিঠি গুলো পড়ার। অন্যদিনের চেয়ে আজকের সকালটা একটু ব্যতিক্রম লাগছে তার। গতরাতের ফ্লাইটে রূপমের স্ত্রী লিজা আর দুই ছেলে-মেয়ে; পরশ আর প্রিয়া বাংলাদেশে বেড়াতে গেছে গ্রীস্মকালীন অবকাশ কাটাতে। গ্রীস্মকালীন ছুটিতে স্কুল প্রায় দু'মাস বন্ধ থাকে। রূপমের বড় ছেলে পরশ এবার "ও" লেভেল ফাইনাল দিল। মেয়ে প্রিয়া এখনও বেশ ছোট। সুখী সংসার রূপমের। স্ত্রী লিজা এখানকার একটি কিন্ডারগার্ডেন এর শিক্ষিকা। প্রবাস জীবনে পরিপাটি সংসার পরিচালনার পরও রূপম সামাজিকতাসহ সাহিত্য-সংস্কৃতি অঙ্গণে বেশ সক্রিয় এবং সফল।

প্রায় দেড় যুগ ধরে লন্ডনে প্রবাসী রূপম। বিয়ের প্রায় পরপরই চলে আসে দুর প্রবাসে। তখন সে ছিল ম্যারিড ব্যাচেলর। সে সময়টা তার কাটতো দুর্বিষহ। চাকরীর মাসিক ভাতার অর্ধেকের ও বেশী খরচ হয়ে যেত স্ত্রী লিজার সাথে কথা বলার ফোন বিল দিতে। অত্যন্ত ব্যক্তিত্বশীল, কোমলপ্রাণ রূপমের প্রতি তার ছাত্রজীবন, কর্মজীবন এমনকি প্রবাস জীবনের সামাজিক চরাচরে অনুরক্ত হয়েছে বহু রমণী। কিন্তু কোন রমণীই রূপমকে তার কর্মপথ থেকে বিক্ষিপ্ত বা বিচলিত করতে পারেনি; তার সকল কাজে নিষ্ঠা আর সততার কারণে। মহিলা সমাজে রূপমের পরিচিতি 'রমণীমোহন' হিসাবে। তার নাম উচ্চারণ করে ভাবীদের আড্ডায় যেমন সরস আলোচনা হয়, তেমনি অবিবাহিতা মেয়েদের মাঝেও ঔৎসুক্য তার কথা, কাজ, পোষাক, ব্যক্তিত্ব আর সাহিত্য নিয়ে।

লন্ডনে একটি বাংলা পত্রিকা আর বাংলা ম্যাগাজিন সম্পাদনার কাজ করে রূপম। প্রচুর লেখা আসে তার কাছে। ফ্যাক্সে, ই-মেইলে আবার কখনওবা ডাকযোগে। নির্বাচিত লেখা গুলোর কোনটি কোন সংখ্যায় যাবে তা সাথে সাথে মনস্থির করে ফাইলে গুছিয়ে রাখে রূপম; যেন প্রয়োজনের সময় লেখাগুলো খুঁজে পেতে সুবিধে হয়। কিছু লেখার সরস অংশ পড়ে একা একাই মিটিমিটি হাসে রূপম। কখনওবা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে; পরে আবার নিজের হাসিকে সংযত করে। হাজার হলেও এটাতো অফিস। পরিশ্রমের মাঝেও এ সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতে আনন্দও আছে। স্ত্রী লিজা কখনও তার স্বামীর এ জগৎটাতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়না। বেশ সংসারী মনের লিজা স্বামীকে সময় করে দেয় তার সাহিত্য-সংস্কৃতির কাজে; আর নিজে তার দুই বাচ্চা, সংসার আর চাকুরীস্থলের কলিগ সহ সামাজিকতার ব্যস্ততায় সময় কাটিয়ে দেয়।

এক এক করে খাম অবমুক্ত করে চিঠিগুলো মন দিয়ে পড়ছে রূপম। থেকে-থেকে তার মোবাইলটা বেজে উঠছে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের সুরে-সুরে। স্বদেশপ্রেমী রূপম ধৈর্য্যের সাথে প্রতিটি ফোন কল রিসিভ করছে, আবার ফিরে এসে বসছে তার চিঠির ঝাপি নিয়ে। অদ্ভুৎ খামটি হাতে নিয়ে রূপম এ পিঠ ওপিঠ বার কয়েক দেখল পর্যবেক্ষণের দৃষ্টিতে। 'মুগ্ধা হক!' বাংলাদেশ থেকে পাঠানো। বাংলাদেশে এত ম্যাগাজিন, পত্রিকা থাকতে এত কষ্ট করে টাইপ করা গল্প এই সুদুর ইংল্যান্ডে কেন

পাঠালো এই মানবী? খাম এর উপর এবং খামের ভেতরের গল্পটা ও টাইপ করে লিখা। লেখিকার নামটা পড়ে রুপম কেন যেন একটু হোচট খেল। এমন নাম আগে কখনও শুনেনি।

এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলল পুরো গল্পটা, এবার রুপম তার বুকের হৃদপিন্ডের সরব উপস্থিতি টের পেল যেন। লেখার শব্দ চয়ণে পরিমিতিবোধ, শালীন উপস্থাপন, গল্পের ঘটনার গতিময়তা পরিচিত কোন লেখিকার সাথে যেন মিলে যাচ্ছে। গল্পকার মানবী যেই হোক না কেন তিনি যে বেশ দক্ষ লেখিয়ে তা তার লেখার ধাঁচেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। অবাক করা ব্যপার হলো গল্পটা যতই পড়ছে; রুপমের মনের অচেনা এক জগতের সবগুলো রুদ্ধ দ্বার যেন এক এক করে খুলে যাচ্ছে। গল্পের কিছু কিছু জায়গায় বোধ আর অনুভূতির কোমল ছোঁয়ায় রুপমের মন ক্রমশঃ দ্রবীভূত হয়ে পড়ছে। 'আলটপ্‌কা' শব্দটায় রুপমের চোখ থমকে গেল। এ শব্দটি তার খুব কাছের, খুব ভাললাগার, খুব প্রিয় একজন লেখিকার লেখায় সে অনেকবার পেয়েছে। যাক গে- গল্পটা রুপমের পড়া হয়ে গেল। একটা নিটোল প্রেমের গল্প। গল্পের বিষয়বস্তুতে প্রেমের যে আকুতি প্রকাশ তা সত্যিই রুপমকে স্পর্শ করে গেল। অস্ফুটস্বরে রুপম বলে উঠলো,

''চমৎকার তো!''

জাফলং এর পাহাড়ি ঝর্ণার কাছে ক্ষাণিকটা এগিয়ে গেল অনিমেষ। জয়ার এলো চুল বাতাসে উড়ছে। কলপ দেয়াতে চুলের রুপোলী রঙ একদম ঢেকে গেছে। জয়া আজ লজ্জাবতী ফুলের রঙে রঙ মিলিয়ে হাল্কা বেগুনি জামদানী শাড়ি পড়েছে। ঘন চুলে মেখেছে জুঁই ফুলের সুবাস মাখা তেল। তেল খুব একটা দেয়না যদিও কিন্তু ইদানিং মাথাটা কেমন যেন দুলে দুলে ওঠে। তাই তেল দেয়া।
রুপম একদিন কথায়-কথায় ফোনে জয়াকে বলেছিলো,

'জয়াদি, আপনার সাথে লজ্জাবতী গাছের খুব মিল আছে। লজ্জাবতী ফুলের রঙটি বেশ।'

রুপমের কথা মনে করেই জয়া আজ লজ্জাবতী রঙের শাড়ি পড়েছে। মুখে হাল্কা প্রসাধনের প্রলেপ মেখে কপালে দিয়েছে হাল্কা বেগুনি টিপ। অনেকদিন পর এমন করে সেজেছে জয়া। মনটা বেশ ফুরফুরে লাগছে। জয়ার কল্পনায় রুপম তার পাশাপাশি হাঁটছে। রুপম জয়াদিকে মাঝে মাঝে 'দেবী' ও ডাকতো। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী থাকা কালীন তাঁত শাড়ি পরণে, লম্বা দুই বিণুনী দুলানো স্নিগ্ধা রমণী জয়াকে অনেক ছাত্রই 'দেবী' নামে সম্বোধণ করতো। শুধু দুর থেকে 'দেবী' শব্দটা উচ্চারণ করে পাশ কেটে চলে যেত ওরা; জয়ার ব্যক্তিত্বের সামনে সাহস করে এসে দাঁড়িয়ে কেউ কিছু বলতে পারেনি কখনও। জয়াদিকে কয়েকবার দেখার সৌভাগ্য হয়েছে রুপমের। বিভিন্ন সাহিত্য আসরে। ভীষণরকম শালীনতা, মার্জিত আচরণ, কথা আর হাসিতে পরিমিতি সব মিলিয়ে জয়াদিকে রুপমের মনে ভাললাগার সর্বোচ্চ আসনটি দিতে ইচ্ছে করতো। কিন্তু জয়ার মনে রুপমের স্থানটি কেমন তা জয়া নিজেও বুঝতে পারতো না যদি না তার হঠাৎ করে এই মারাত্মক অসুখটা ধরা পড়তো। জয়া ভেবেছিল এ যাত্রায় আর নিস্তার নেই। ক্যান্সারে তার মৃত্যু অণিবার্য। কিন্তু না, মরতে ইচ্ছে হলোনা জয়ার। জয়া বাঁচতে চায়। তার জীবনের অসম্পূর্ণতাটুকুন পুষিয়ে নিতে চায় রুপমের সাথে তার কল্পনার রোমান্সে।

নিজের এহেন পরিবর্তনে জয়া নিজেই খুব অবাক হয়। উত্তর চল্লিশে তার জীবনে 'বেলা শেষের গান' হয়ে কিনা প্রেম এল? জয়ার মনের অবস্থার এ দিকটি যদিও রুপম জানতোনা কিন্তু এক আধটু যে রুপমের কাছে ধরা পড়েনি; তাও কিন্তু নয়। রুপম বুঝে ওঠার আগেই হেসে, কথার মোড় ঘুরিয়ে নিয়ে জয়া নিজেকে সামলে নিত।

রূপম মাঝে মাঝে অবাক হয়ে ভাবতো; জয়াদি কেন কথার ফাঁকে ফাঁকে আবৃত্তি করে ফোনে গান শুনায় গুনগুনিয়ে। তার সাথে কথা বলতে এত কাব্যিক আর এলো হয়ে যায় কেন তার প্রিয় জয়াদি? জয়া প্রতি সকালে রূপমের ফোনের অপেক্ষা করতো অধীরা হয়ে। ডাক্তারের দেয়া ঔষধ আর স্বামী সন্তানের ভালবাসার চেয়েও যেন মহৌষধ রূপমের কথা। জয়ার মনে তার সাহিত্যিক বড় ভাইটির আদর্শ ছায়া যেন মূর্ত রূপমের মাঝে।
অনেক বছর আগে জয়া যখন ব্রিষ্টল শহরে ছিল; তখন একবার কথা প্রসঙ্গো রূপম জয়াকে বলেছিল–
 'জয়াদি যুদ্ধ আর প্রেমের কোন সময় অসময় নেই।'
সত্যিই যে জয়ার তাই হলো। জয়ার জীবনের এই প্রেম জয়াকে দিল জীবনে বেঁচে থাকবার নতুন আশ্বাস, অকৃত্রিম প্রেরণা। জয়া তাই বাঁচতে চায়।

গ্রীস্মকালীণ অবকাশ কাটানোর বেশ গুছানো আয়োজন নিয়ে দেশে এসেছিল বটে; তবে কেন যেন অস্থিরতায় জয়ার মন মাতাল। মনের এই নবজাগা অস্থিরতার তাড়না আর তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় জয়ার নিজের কাছেই নিজেকে অচেনা লাগছে। স্বামী অনিমেষ আর ছেলে প্রবাল সহ সিলেটের জাফলং, লাক্কাতুরা পাহাড় দেখতে যাওয়া সব কিছুই চলছে কিন্তু জয়ার মনটা যেন কোথাও নেই। উদাসীন ভাবটা জয়ার স্বামীর চোখ এড়ালোনা। জয়াকে প্রশ্ন করলেন শ্রী অনিমেষ–
 'এবার তোমার কি হয়েছে বলোতো জয়া? বিয়ের পর এই প্রথম তোমাকে আমার অচেনা লাগছে। মনে হচ্ছে কাছের মানুষ হয়েও তুমি অনেকটা দুর। যেন অশরীরী কেউ তুমি। যার ছায়া পর্যন্ত নেই আমার কাছে। শুধু অবস্থানটুকুন টের পাওয়া যাচ্ছে। আমি তোমার গা স্পর্শ করলে; তোমার কাছে এসে দাঁড়ালেই তুমি চমকে চমকে ওঠো। অপ্রকৃতস্থ আচরণ কর। আমি কি জানতে পারি জয়া, কেন তোমার এ অস্থিরতা?'
জয়া উত্তরে কি বলবে, ভেবে পাচ্ছেনা। আসলেই কি এমন কথা পৃথিবীর কাউকে বলা যায়? স্বামীর কাছে নিজের মনের ভাবটা আড়াল করতে শুধু বললো–
 'নাহ্। তেমন কিছু নয়। এখানে আসার আগে বেশ কষে ডাইয়েটিং করছিলাম তো, তাই হয়তো প্রেসারটা লোও যাচ্ছে। যা মোটা হয়ে গেছি ইদানিং।'
ঝর্ণার জলে ভিজতে লাগলো জয়া। জয়ার গায়ের লজ্জাবতী রঙ জামদানী শাড়িটা ভিজছে। জয়া চোখ বুজে চুল ঝাঁকিয়ে হাসছে আর বলছে–
 'কি যে ভাল লাগছে! আহ!! পানিটা এত ঠান্ডা!'

সিলেট থেকে ঢাকা ফিরে এসে ছেলে প্রবালের জন্য প্লে-ষ্টেশন, সিডি সহ জুতা আর ড্রেস কিনতে নিউমার্কেট গেল জয়া। নিউমার্কেটের বলাকা গেইটের কাছে বসে থাকা বিক্রেতাদের কাছ থেকে কদবেল, আমলকি, আমসত্ব কিনে বাসায় ফেরার পথে জয়ার খেয়ালীমনে ইচ্ছে জাগলো রূপমকে নতুন করে আবিস্কার করার। তাই পরদিন জয়া একা একা গেল নীলক্ষেতের 'বাকু শাহ্ মার্কেটে'। গল্পটি বাড়িয়ে দিল ওখানকার একজন টাইপরাইটারের কাছে। সেই সাথে বাড়িয়ে দিল একটি নীল খাম। গল্পের নাম . . . . লেখিকাঃ মুগ্ধা হক। টাইপ করতে লাগলো টাইপরাইটার . . . .

অণিমেষ এর অবকাশকালীন ছুটির মেয়াদ শেষ বিধায় ম্যানচেষ্টারে ফিরে যেতে হবে। কথা ছিল জয়া আরও একমাস বেশী থাকবে দেশে। ছেলে প্রবালেরও ভালই লাগছিল বাংলাদেশে থাকতে। আরও কিছু জায়গায় বেড়ানোর প্ল্যান ঠিক করে রেখেছে প্রবাল। নন্দন পার্কে তো যাওয়াই হোল না। তা

ছাড়া নতুন বিয়ে হওয়া পিসির শ্বশুরবাড়ীতেও যাওয়া হোলনা। কিন্তু নাহ্। জয়া ফিরে যেতে চাইছে ম্যানচেষ্টারে। বলছে–

‘এই গরমে কি থাকা যায় বলো? কি বিচ্ছিরি বৃষ্টি হচ্ছে প্রতিদিন। শেষে না আবার বন্যার কারণে আটকে যাই। চলো চলো। আমাদেরকে তোমার সাথেই নিয়ে চল ইংল্যান্ডে।’

মানচেষ্টারে ফিরে এসে জয়ার মনের অস্থিরতা আরও বেড়ে গেল যেন। বুকটা কেমন যেন ধর ফর করে। মাথাটা দুলে ওঠে। সমস্ত শরীর ভেঙ্গে চুরে যায় যেন। প্লেয়ারে ক্যাসেট ঢুকিয়ে প্লেয়ার অন করে জয়া–

‘সোনার কাঠি রূপোর কাঠি তোমার হাতে দিলেম .. .. .. ’সা্ইফুল ইসলামের গাওয়া এ গানটি এবার ঢাকার ‘গীতালী’ ক্যাসেটের দোকান থেকে সংগ্রহ করে এনেছে জয়া। গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে রান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে জয়া।

অণিমেষ পরদিন যথারীতি অফিসে চলে গেল সকালে। স্কুলের ছুটি শেষ হতে আরও কিছুদিন বাকি, তাই প্রবাল আঘোরে ঘুমুচ্ছে নিজের ঘরে। অণিমেষকে বিদায় করে বিছানায় আলুথালু হয়ে ঘুমুচ্ছে জয়াও।

ক্রিং .. ক্রিং.. ক্রিং.. ক্রিং ফোনে চারটি রিং বাজতেই ঘুম জড়ানো কণ্ঠে জয়া ফোন রিসিভ করে বললো– হ্যা .. লো .. ও .. ও ....

রূপমের কণ্ঠস্বরে লঘু আমেজ। একটু হেসে রূপম জিজ্ঞেস করলো–

‘হ্যালো; মুগ্ধা হক কেমন আছেন?’